দেশ মেরামতের কাজে আমরা এগিয়ে আসতে পারি

অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে যেতে হলো। চলতে পথে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, উন্মুক্ত প্রকৃতি, মানুষ, পরিবেশ, দিগন্ত-বিস্তৃত মুক্তাকাশ, একটা ভাবুক মন ও মনের পর্যবেক্ষণ নিয়ে এ ভ্রমণ। গ্রামে যেতে কমপক্ষে আড়াইশ কিলোমিটার সামনে চলতে হয়। এ চলাতে মনের মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা আন্ডারলাইং এজামশনের সত্যতা বারবার যাচাই করি। পত্রিকার পাতায় লিখে সে দেখা অনেক সময় প্রকাশ করি। মূর্ত (কংক্রিট) কোনো বিষয়কে দেখে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলে সত্য প্রকাশ করলে কোনো বাধা আসে না। বিমূর্ত (এবসট্রাক্ট) কোনো বিষয় যেমন– পরিবেশ, মানুষের আচার-আচরণ, সমাজ নিয়ে কোনো সত্য প্রকাশ করতে গেলেই আপত্তি আসে। আমার সহকর্মী, পরিচিতজনের কেউ কেউ গবেষণাভিত্তিক কিছু লিখতে বলেন। বুঝি, আমার এ লেখা কোনো রাজনীতির পক্ষাবলম্বন হয় কি-না, তাই। পক্ষে লিখতে পারলেই কেউ কেউ বাহবা দেন, বিপক্ষে গেলেই যত আপত্তি। লেখাতে গবেষণার সমর্থন চান। এ দেশে যেহেতু সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে গবেষণা কম। তাই পরিণামে বিমূর্ত কোনো বিষয়ে লেখা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। আমার বক্তব্য ভিন্ন। গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসার পথে, গ্রামে বসে, প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় যা বারবার দেখছি ও শুনছি, ভাবুক মনের এটাও এক ধরণের গবেষণা। একে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা বলা যায়। বিষয়টা মূর্ত, বিমূর্ত যা-ই হোক, সত্য সত্যই। রাজনীতি সমাজ নিয়ে ডিল করে। আমরাও প্রাতিষ্ঠানিক, সমাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ নিয়ে লিখি। সেজন্য কোনো কোনো বিষয়ে রাজনীতির চলতি ধারণার সাথে আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের লেখা কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়; সামাজিক অবক্ষয়, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুর্নীতি, দুরাচারবৃত্তির বিরুদ্ধে।

ঢাকা থেকে বেরোতেই পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদী। সমস্ত প্রকার জঞ্জাল, আবর্জনা, বর্জ ফেলে পানি আজ কলুষিত, ব্যবহারের অযোগ্য, দুর্গন্ধময়। এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেও কেউ হয়তো ঐ পানিতে ডুব দিতে রাজি হবে না। আমরাই নদীটাকে নষ্ট করে ফেলেছি, দেশের রাজনীতির মতো। নদীতে এখনো স্রোতের গতিময়তা আছে। ভাবি, এ নদীর পানি কি আবার ব্যবহার ও অজু-গোসলের উপযুক্ত করা যায়? মনের দৃঢ়তা বলে, ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব। কাজটা করার জন্য ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ট। আশায় বুক বেঁধে আছি, নদীর পানিতে একসময় স্বচ্ছতা আসবে।

পথ চলতে অগনিত মানুষ, সমাজ, পরিবেশ পেরিয়ে তারপর নিজের ঠিকানা। চলতে পথে এক ঠোঙা মুড়ি কিনে খেলেও মুড়ির মানকে যাচাই করি, মুড়িতে ইউরিয়া সার মেশানো আছে কিনা দেখি, সরষের তেলের ভেজাল কতটুকু ইত্যাদি বিবেচনা করি। বিক্রেতা লোকটার আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করি। এভাবে প্রতিদিন শত কাজের মধ্যে এদেশের মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের উত্থান-পতন মনের মুকুরে গেঁথে সাজাচ্ছি। প্রতিটা পদে পদে হাজারো মানুষের মনের সাথে অবিরাম ক্রসিং করছি। সিদ্ধান্তে আসছি। দেখছি, আমরা মনুষ্যত্ববোধ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। পরিবেশ ও সমাজের মূল উপাদানও এই মানুষ। পরিবেশ ও সমাজও বুড়িগঙ্গা নদীর স্রোতের মতো বহমান, গতিশীল। এর অবস্থাও বুড়িগঙ্গা নদীর মতো বানিয়েছি। ইচ্ছে করলেই তা ভালো বা খারাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারি। সেখানেও ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ট। সমাজ পরিচালকদের মন-মানসিকতা ও স্বভাবের উপর নির্ভর করে সমাজ সামনের দিকে ধাবিত হয়। আসলেই তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজ তাদেরকে অনুসরণ

করে। এটা সমাজ ও পরিবেশের নিয়ম। নদীর পানিতে স্বচ্ছতা আনতে পারলে সমাজ ও পরিবেশেরও ইতিবাচক পরিবর্তন ও সুস্থতা আনা সম্ভব। আশায় বুক বেঁধে আছি, সমাজ ও পরিবেশ একদিন নিশ্চয়ই ভালো হবে। প্রয়োজন সমাজ পরিচালকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও সদিচ্ছার। বর্তমান সমাজ ও পরিবেশের দিকে তাকালে দেখি উপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত দুর্নীতি, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, ক্ষমতার দাপট, কুশিক্ষা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজি, দুরাচারদের দৌরাত্ম্য, প্রতারণা, পরিবেশের অধোগতি, মনুষ্যত্বের ঘাটতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর দায় কোনো একক রাজনৈতিক দলের উপর চাপিয়ে লাভ নেই। বিগত একান্ন বছরে আমরা দিনে দিনে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এ সবকিছু দিনে দিনে সামাজিক নিয়মে রূপ নিতে চলেছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথের সন্ধান না করতে পারলে আমাদের পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। তখন কোনো দলের প্রতি আনুগত্য, দলবাজী, তন্ত্র-মন্ত্র আর কাজে আসবে না।

গ্রামের পাশে বাজারে গেলাম। গ্রামের প্রতিটি তেমাথা পথের ধারে চায়ের দোকান গড়ে উঠেছে। সেই ভোররাত থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রতিটা দোকানে লোকজনের ভীড় লেগেই আছে। বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের আড্ডা। অবিরাম পারস্পরিক দোষারোপ চলছে। বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা, মতামত-একের প্রতি অন্যের ছিদ্রান্বেষণ চলছে। কে কাকে কীভাবে পরাস্ত করতে পারবে তার কুটকৌশলও চলছে। সাথে চলছে একের বিরুদ্ধে অন্যের চরিত্রহনন। কে কাকে কোন কুটবুদ্ধি খাটিয়ে ল্যাং মারবে, চলছে তার অবিরাম রিহার্সল। এ এক আজব সমাজ ও পরিবেশ। কোনো সামাজিক শিক্ষা নেই, জ্ঞানের কোনো কথা নেই, নেই কোনো জীবন উন্নয়নমুখী আলোচনা, উন্নতির ভাবধারা, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা। শুধু পরচর্চার উপর ভিত্তি করে এভাবে কোনো সমাজ চলতে পারে না। চললেও পরিণতি ভালো হয় না। গ্রামে দেখলাম, কোনো রাজনৈতিক কর্মী নেই, শৃঙ্খলা নেই, শুধুই সামাজিক দ্বন্দ্ব, গ্রুপিং, মারামারি– সকলেই যেন 'বিরাট মহান নেতা'। মগজটা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের ধান্দায়।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা মানুষের মনোভাব ও আচরণের উপর ভিত্তি করে মানুষকে এক্স গ্রুপ ও ওয়াই গ্রুপে ভাগ করেছে, আবার পরে জেড গ্রুপও করেছে। অর্গানাইজেশনাল বিহ্যাভিয়ার মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচরণকে 'সিটিজেনশিপ বিহ্যাভিয়ার' ও 'উইথড্রোয়্যাল বিহ্যাভিয়ার'– এ দুভাগে ভাগ করেছে। আমার দেখায় অন্য দেশের মানুষের মতো বাঙালির মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের বিভক্তি এভাবে সঠিক হয় না। এটা আচরণগত। এ দুটোর সমন্বয়ে 'বাঙালি বিহ্যাভিয়ার' নামে আরেকটা আলাদা শ্রেণিবিভক্তি করা সমীচীন হবে। প্রতিটা ধর্মও মানুষকে ভাগ করেছে। সনাতন ধর্ম দেবতাদের পক্ষের শক্তি ও অপ-দেবতাদের পক্ষের শক্তি– এ দুভাগে মানুষকে বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্ম মানুষকে তার বিশ্বাস এবং ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বিভাজন করেছে। আমাদের দেশে আমরা সুবিধাবাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে গিয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীকে ভাগ করেছি। এদেশে কে চরিত্রগত ও স্বভাবজাতভাবে ভালো বা মন্দ, কে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত– এ বিভাজনের কোনো গুরুত্ব নেই। কোনো কাজ করতে গেলে আগেই প্রশ্ন ওঠে, কে কোন দল করে; অর্থাৎ ভাগ করেছি রাজনৈতিক দলবাজির ভিত্তিতে। সব দলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যার যত মুখের জোর, পারস্পরিক দোষারোপ ও লাঠির জোর, দলে তার গুরুত্ব বেশি। সেই তত ত্যাগী নেতা। আমার দল করলেই সে ধোয়া তুলসীর পাতা, আমার বিরুদ্ধে গেলেই যত গালাগালি। প্রয়োজনে কাউকে দমন করার জন্য কিংবা দুর্নাম রটানোর জন্য নামের আগে বা পরে মনগড়া একটা খারাপ বচনের ট্যাগ ঝুলিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। এভাবেই রাজনৈতিক

পরিবেশ, সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, সমাজ বেওয়ারিশ চলছে। সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ দেশ ছাড়া বিশ্বে কোথাও এ ধরনের বিভাজন আছে বলে আমার জানা নেই।

আমাদের চামড়ার চোখে যেটুকু দেখি, মানুষের কেউ কেউ আছেন মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ, জাগ্রত বিবেক দ্বারা চালিত, সুশিক্ষিত। নিজের থালার ভাত অন্যকে ভাগ করে দিয়ে সবাই মিলে খেয়ে তৃপ্তি পায়। আবার অনেকেই আছেন অন্যের থালার ভাত কেড়ে নিয়ে নিজের থালা ভরে তৃপ্তি পায়। কেউ নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, আবার কেউ বনের মোষ নিজের খোঁয়াড়ে এনে বাঁধে। সবই মানুষের প্রকৃতি। সব প্রকৃতির মানুষই সমাজে আছে। মানুষের এই নৈতিক ও মানসিক ভিন্নতাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না! এই প্রকৃতি বা স্বভাবের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব না দিয়ে আমরা যদি ভালো-মন্দ এক করে ফেলি, মন্দ স্বভাবের লোকগুলোকে সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিই, তখনিই যত বিপত্তি এসে দেখা দেয়। সেজন্য সামাজিক উন্নয়ন ও সুস্থ পরিবেশ অধরাই রয়ে যায়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে মানবসম্পদ বলে। আমার মতো দুর্মুখেরা অন্য অংশকে 'মানব আপদ' বলি। মানবসম্পদ অংশকে আমরা সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীও বলতে পারি। প্রতিটা এলাকাতেই এই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক দায়িত্ব রয়ে গেছে। তারা দায়িত্ব সচেতন। আমরা তাদেরকে দায়িত্ব পালন থেকে দূরে রাখছি। তাদের অনেকেই বর্তমানে সামাজিক কোনো কাজে আর নিজেকে জড়াতে চান না। অর্থনীতির একটা নীতি হলো খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে বের করে দেয়। সমাজের খারাপ লোকগুলোও খারাপ পরিবেশ ও সমাজ দিয়ে ভালো স্বভাবের লোকগুলোকে ঘরাবদ্ধ অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে। আমরা আমাদের সমাজ ও পরিবেশ গড়ার কাজ এই সুশিক্ষিত লোকগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তাদেরকে ঘরের বাইরে বের করে এনে কাজ দিতে পারি। তারা 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গড়তে পারেন।

সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন পথ সমাজ পরিচালকরা বেছে নিয়েছেন। উন্নতির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফলাফল বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোনো সমাজের সুশিক্ষিত অংশ দিয়ে সেই সমাজের সুশিক্ষার আলো-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া, ভালো হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়মিত কাউন্সিলিং করা, সামাজিক সেবা দেওয়া সমাজ-শিক্ষার উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের একটা পথ (এ্যাপ্রোচ) হতে পারে। এটা মানবসম্পদ গড়ার একটা প্রক্রিয়া। সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ ভালো হয়ে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর এর সুপ্রভাব পড়তে বাধ্য। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজসেবার এ কাজকে পরকালের জন্য ইবাদত হিসেবেও গণ্য করতে পারেন, আবার সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও নিতে পারেন। এভাবে এ দেশের অনেক সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। একবার শুরু করতে পারলেই দিনে দিনে এটা সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ এভাবেই পরিবেশ ও সামাজিক শিক্ষা উন্নত করেছে। এ পথ বিনা-খরচের একটি ধন্বন্তরি ও উপাদেয় পথ। জনগোষ্ঠী ও সমাজ এটা বিনা বাধায়, নির্দ্বিধচিত্তে মেনে নেবে। শুধু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। দেখতে হবে কেউ যেন ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থে এদের নামের আগে বা পরে কোনো খারাপ শব্দের মতলববাজির ট্যাগ না লাগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে প্রতিটা জেলা ও উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের একটু যত্নবান হতে বললেই চলে।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় উন্নয়নের যত পথের কথাই আমরা বলি না কেন, মানবসম্পদের উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন ও উৎকর্ষ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিগত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে এদেশের অনেক দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেখানে সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজসেবার উন্নয়নে উল্লিখিত এ মডেল বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। মূলপ্রবন্ধকার বলেন, 'জাশিপ' একটি সামাজিক আন্দোলন যা দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমাজসেবা করার জন্য একত্র করবে, প্রতিটি এলাকায় সামাজিকভাবে ও কেন্দ্রীয়পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাবে। অনেক শিক্ষাবিদ অনেক দিক-নির্দেশনামূলক ও গঠনমূলক বক্তব্য এ অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের' মূল নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করেছেন। এদেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সংবাদ মাধ্যম এভাবে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশ মেরামতের কাজে অংশ নিতে পারেন। আশা করা যায়, 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' জাতীয় উন্নয়নে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে।

(৩ মার্চ ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।